অন্বেষণ

# বুদ্ধের হিমালয়, হিমালয়ের বুদ্ধ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

বছরটা ১৯৯৭। তক্ষশিলা প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়াম সংলগ্ন ডিরেক্টরের বাংলোতে চা-চক্রে অংশ নিয়েছিলেন ব্রিটিশ প্রশাসনে ছয় প্রজন্ম অংশগ্রহণকারী পরিবারের সন্তান প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ চার্লস অ্যালেন। অ্যালেনের জন্ম ভারতে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই তক্ষশিলা সাইরাস দ্য গ্রেট প্রতিষ্ঠিত প্রথম পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬-এ এখানেই চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট মিলিত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে পিতা বিন্দুসারের নির্দেশে মৌর্য সম্রাট অশোক পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা) থেকে এসে এই তক্ষশিলার প্রশাসক হয়েছিলেন, যাঁর পিতামহ এই চন্দ্রগুপ্ত। অশোক ছিলেন বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম রাজনৈতিক বার্তাবাহক। পরবর্তী কালে সম্রাট কণিষ্কের হাতে বৌদ্ধধর্মের গৌরব বৃদ্ধি পেলেও হুন শাসক মিহিরকুলের হাতে নেমে আসে নিষ্ঠুর হত্যালীলা।

এদেশে প্রথম প্রশিক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক জন মার্শাল প্রতিষ্ঠিত এই তক্ষশিলার সংগ্রহশালায় মার্শালের ব্যবহৃত পোর্সেলিন পাত্রে চা পান করে তরুণ অ্যালেন যেমন রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন, তেমনই বেদনাবোধ করেছিলেন সংগ্রহশালাটির বর্তমান দুরবস্থা দেখে। ইফতারের আসরে নিমন্ত্রিত অ্যালেনকে মিউজিয়ামের তরুণ অধ্যক্ষ দুঃখ করে জানিয়েছিলেন, কর্মচারীদের বেতন দিতে না পেরে কী ভীষণ অসুবিধার মধ্যে তিনি এটিকে খোলা রেখেছেন।

প্রাচীন তক্ষশিলার একটি অংশে মাত্র স্যার জন খননকার্য চালাতে পেরেছিলেন। লেট ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যের এই জরাজীর্ণ সৌধে ইঞ্চিপুরু ধুলোয় অনাদরে রক্ষিত গান্ধার সংগ্রহের অমূল্য বস্তুগুলি টর্চের আলোয় দেখেছিলেন অ্যালেন। সিলিং থেকে চুঁইয়ে পড়া বৃষ্টির জলে কণিষ্কের স্মৃতিবাহী দ্রব্যসামগ্রী (যেগুলি জন মার্শাল পরম যত্নে রেখেছিলেন) দেখে যারপরনাই বিচলিত হয়েছিলেন তিনি।

কিছুদিন পর জালালাবাদের হাড্ডাতে মুজাহিদিন থেকে তালিবান হওয়া গাইডের কাছে তিনি শুনেছিলেন রুশ ট্যাঙ্কের সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধে ১৯৭০-এ ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিকদের হাতে আবিষ্কৃত অন্যতম সেরা বৌদ্ধবিহার কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধ গুহা তথা যেসব চৈত্যগুলিতে লাদেন ও তার সহকারীরা আত্মগোপন করেছিল সেগুলি বামিয়ানে মোল্লা ওমরের নির্দেশে ডিনামাইটে ধ্বংস করা হয়।

তারও আগে বুলডোজার দিয়ে রুশ সৈন্যরা কণিষ্কর গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ গুঁড়িয়ে বাগরামে এশিয়ার বৃহত্তম বিমানক্ষেত্র বানিয়েছিল।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে শ্বেত হুন মিহিরকুল, তৈমুর লঙ থেকে মাও বা মোল্লা ওমর-এর মতো শক্তিধরদের হাতে ভগবান তথাগতকে যে-পরিমাণ নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে ভাবা যায় না। তিব্বত তথা সমগ্র চিনে আড়াই হাজার বছরের বৌদ্ধধর্ম ও সত্তর বছরের কমিউনিজমের অসম লড়াইশেষে আজকের চিন দানবীয় শক্তিতে যেন প্রায়শ্চিত্ত করছে বুদ্ধের পুনর্বাসনে।

লক্ষ করলে দেখা যাবে ভগবান বুদ্ধের এই বিশ্বব্যাপী জয়যাত্রায়, বিশেষ করে এশিয়ার এক বিশাল অংশের বুদ্ধিমুক্তিতে, নগাধিরাজ হিমালয় এক মহান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

বর্তমান প্রয়াসে একদিকে সমগ্র হিমালয় জুড়ে গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর প্রচারিত ভাবনার জোরালো উপস্থিতি ও অন্যদিকে বুদ্ধদেবের নিজের দেশ ভারতবর্ষে তাঁর হারিয়ে যাওয়া ও বিদেশিদের হাতে পুনরাবিষ্কৃত হওয়ার ঘটনাবলিকে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

## অনন্ত সঞ্চিত তপস্যা

বিদেশে স্বামী বিবেকানন্দকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, ‘‘বেদান্ত আপনার দেশের বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক আবিষ্কার। বেদান্ত দর্শন আপনারও স্বকীয় জীবনদর্শন, তথাপি আপনারা পৌত্তলিক কেন?’’ স্বামীজী উত্তরে বলেছিলেন, ‘‘Because we have got our Himalayas.’’

হিমাচল ভারতের অনন্ত সঞ্চিত তপস্যার মতো। পাদুম, পাঙ্গি, কেলং, কাজা, কিন্নর, লে, লাহুল, রূপসু কিংবা আরও গভীরে সিন্ধুতীরের দা-হানু—এই স্থানগুলি যেন স্বর্গের এক-একটা দ্বার খুলে দেয়। পামিরকে যদি পৃথিবীর ছাদ বলি, তাহলে তার দুই বাহু—হিন্দুকুশ আর হিমালয় দিয়ে সুরক্ষিত এই উপমহাদেশ। ভৌগোলিক অবস্থান কিংবা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন, উভয় দিক দিয়েই পশ্চিম হিমালয় এই পৃথিবীতে এক বেনজির বিস্ময়। বিশ্ব-মানচিত্রের কোথাও এতগুলো পর্বতশ্রেণি ও সেইসঙ্গে জনজাতির মিলন লক্ষ করা যায় না। হিন্দুকুশ, হিমালয়, কারাকোরাম, কুনলুন প্রভৃতি পর্বতমালাই শুধু নয়, এখানে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলিও পরিণয়বদ্ধ হয়েছে তিব্বত-বর্মি ভাষা ও লিপির সঙ্গে। পশ্চিম হিমালয়ের অমোঘ আকর্ষণে মিলেমিশে গেছে নীলচোখ উন্নতনাসিকার ককেশীয় মানুষজন থেকে শুরু করে দূরতম মঙ্গোলীয় জনজাতিগুলি। স্মরণাতীত কাল থেকেই রেশম সড়কের ধূলিধূসর পথে পণ্যবোঝাই পশুর ক্যারাভানে মুখরিত হয়েছে খোটান, কাশগড়, সমরখন্দ, বুখারা, বামিয়ান, কাশ্মীরের ব্যস্ত বহুজাতিক বাজারগুলি। লেখার কাগজ, চাষের লাঙল, ছাপার হরফ, জড়িবুটি, বিজ্ঞান, স্থাপত্যের সঙ্গে এসেছে বৌদ্ধধর্ম। মহাজনপদের সাতকাহন। যুগান্তের মানবমিছিলে আত্তিলা, তৈমুর, চেঙ্গিস, কুবলাই, মার্কো, ফা হিয়েন, হিউয়েন সাং, শান্ত রক্ষিত, কমলশীল, পদ্মসম্ভব, দীপঙ্কর একাকার।

এশীয় সভ্যতার এই মিলনভূমিতে অনুঘটকের কাজ করেছে বিশাল রহস্যময় তিব্বত। নিজের শীতল মরুবালুর আভিজাত্য বজায় রেখে সে এক-তৃতীয়াংশ বিশ্ববাসীকে কেবল পানীয় জলই দান করেনি, সুনামি-সৃষ্ট জলাভূমির মতো সৃষ্ট করেছে হিমবন্ত ভারতভূমিতে খণ্ড খণ্ড ভারতীয় তিব্বত।

অনেকের মতে এশীয় শিল্প উপবৃত্তের দুই নাভি ভারত ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে প্রথম পরিচয় ঘটে সম্রাট অশোকের সময়ে। চিনে তখন সম্রাট শি হোয়াং তি। পরবর্তী কালে টিয়েনশান পর্বতমালার সানুদেশ ও তাকলামাকান মরুভূমির সমান্তরালে বয়ে চলা তারিম নদী বরাবর রেশম তথা মশলা সড়কে কাশগড়, কুচ, তুরফান, মোগাও প্রভৃতি জনপদ ও মরূদ্যানে গড়ে উঠতে লাগল একের পর এক মরু-সঙ্ঘারাম। সেই সঙ্গে পড়ল অজন্তা শিল্পের স্বাক্ষর। আজকের চিনে এইসব কেন্দ্রগুলির সম্মুখে প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থার ফলকে সেকথা সবিশেষ উল্লেখ করা আছে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গুহাচিত্র ও ভাস্কর্য ক্রমশ পশ্চিম থেকে পুবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পঞ্চম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত তা ছিল বিস্তৃত।

চিনা বৌদ্ধ শিল্পকলার সেরা নিদর্শন হিসাবে তিনটি স্থানকে চিহ্নিত করা হয়—মোগাও, লঙমেন আর উনগাঙ। গানসু প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ডানহুয়াঙ-এ ৩৬৬ খ্রিস্টাব্দে ৪৯২টি বুদ্ধমন্দির গড়ে উঠেছিল। ১০০০ বছর ধরে গড়ে ওঠা ওই চৈত্যগুলির মধ্যে মোগাও অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তাঙ যুগে রানি য়ু-র শাসনকালে লি জাংশিউ তাঁর চিনাভাষায় লেখা ফোকান জি (An Account of Buddhist Shrine) গ্রন্থে এই মোগাও-এর কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তারও আগে, সা ঝাউ তু জিং (Geography of Shazhou) গ্রন্থেও এই অঞ্চলের বর্ণনা মেলে। স্বল্পায়ু সুই রাজত্বে ও পরবর্তী কালে তাঙ আমলে এই ভাস্কর্য সংস্কৃতি বিকশিত হয় হাজার হাজার গুহায়। ইতিহাস-সচেতন চিনাদের এই প্রয়াস নতুন করে আবিষ্কার করে 'লাইব্রেরি কেভ'। এটি আবিষ্কৃত হয় ১৯০০ সালের ২৫ জুন জনৈক তাওবাদী চিনা ওয়াঙ উয়ানলুর হাতে। বালি সরিয়ে পাথরবন্দি অসংখ্য পাণ্ডুলিপি, ছবি প্রভৃতি উদ্ধার করা হয় লাইব্রেরি কেভ থেকে।

ওয়াঙ-এর আবিষ্কারের ঘটনা হাঙ্গেরিয় প্রত্নতাত্ত্বিক অরেল স্টেইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্টেইন সেইসময় এক ইন্দো-ব্রিটিশ যৌথ প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি

'লাইব্রেরি কেভ'-এর গুহাচিত্র

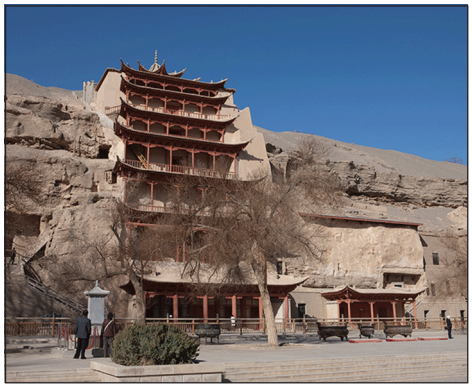

মোগাও-এর ডানহুয়াঙ গুহার প্রবেশদ্বার

টাকার বিনিময়ে ওয়াঙের অনুমতি নিয়ে অজস্র পাণ্ডুলিপি, ছবি ও সিল্ক স্ক্রোল নিয়ে আসেন। পরবর্তী কালে ১৯০৮-এ ফরাসি পল পিলোঁ (Paul Pelloit), ১৯১১-তে জাপানি ওটানি কোজুই ও ১৯১৪-তে রুশ সের্গেই ওস্তেনবার্গও কয়েক হাজার নিদর্শন সংগ্রহ করেন। স্টেইন ও পিলোঁ পশ্চিমি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করলেও চিনারা প্রথমদিকে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। এক্ষেত্রে সেকালের ভারত ও চিন উদাসীনতায় সমগোত্রীয়। ভারতবর্ষে লর্ড কার্জন দেখেছিলেন ভিক্ষুক ভবঘুরেদের তাজমহলে বসবাস করতে, খাজুরাহোর অমূল্য সৃষ্টি ভেঙে তৈজসপত্রের কাজে লাগাতে।

মোগাও গুহার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট চিনা বিশেষজ্ঞ লুও ঝে নিউ বাকি পাণ্ডুলিপি নষ্ট না করার উদ্যোগ নিলেও সবটা তদনীন্তন পিকিঙে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। যেটুকু উদ্ধার করা গিয়েছিল তার কিছু চুরি হয়, বাকিটা রুশ বিপ্লবে দেশত্যাগী জারের সৈন্যদের হাতে নষ্ট হয়, যেমনটি হয়েছিল পর্তুগিজদের হাতে এলিফান্টা গুহা। পলাতক রুশ পল্টনরা ওই ডানহুয়াঙ গুহায় শিবির করেছিল। একালের ইতিহাসে চিনের অজন্তা রুশ পল্টনের হাতে ক্ষতবিক্ষত হলেও ভারতের অজন্তাকে কিন্তু অবগুণ্ঠনমুক্ত করেছিল বাঘশিকারি একদল ইংরেজ পল্টন।

মোগাওয়ের ভাগ্য কিছুটা ফেরে ১৯৪১ সালে, যখন চিনা চিত্রকর ঝাঙ ডা কিয়াং আড়াই বছর ধরে ম্যুরাল চিত্রগুলিকে সংস্কার করেন। একই সময় ঐতিহাসিক সিয়াং ডা কুওমিংটানের আমলে গঠিত হয় Research Institute of Dunhuang। অবশেষে নয়া চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৬১-তে এটি প্রত্যাশিত মর্যাদা পায়।

নারায়ণ সান্যালের লেখা থেকে জানা যায় এখানকার বিশ্বান্তর জাতকের একটি কাহিনিচিত্রের নিচে রোমান হরফে তিতা বা তিতাস নামের এক চিত্রকরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মোগাওয়ে মঞ্জুশ্রী ও বিমলাকীর্তির সাক্ষাৎ কিংবা বোধিসত্ত্বের জনৈকা নারীকে পবিত্র ভূমির (ভারতবর্ষ) পথে যাত্রার নির্দেশের মতো চিত্রগুলিতে ভারত-চিন যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। মোগাও গুহায় অবলোকিতেশ্বর ও সাতান্ন জন সন্ন্যাসীর বোধিসত্ত্ব-পূজার ম্যুরালটি অতীতে সোনার পাতে মোড়া ছিল।

অজন্তার সঙ্গে ইলোরার যেমন কিউ-ইউ সম্পর্ক, মোগাওকে বাদ দিয়ে লঙমেন তেমনি অসম্পূর্ণ।

অজন্তায় যেমন গুহাগুলি অর্ধবৃত্তাকার শীর্ণা তটিনী বাগোড়ার তীর বরাবর খাড়া পাহাড়ের গায়ে নির্মিত, লঙমেন তেমন নয়। এখানেও নদী আছে পুব-পশ্চিমে প্রবাহিত। বাগোড়ার তুলনায় বেশ বড় এই নদীর নাম ই (Yi)। দুই তীরে সবুজে ঢাকা পাহাড়ের কোলে প্রায় ১৪০০টি ছোট-বড় গুহায় এক লক্ষ লঙমেন বুদ্ধকে অসামান্য নৈসর্গে সাজিয়ে তুলেছে এই স্বচ্ছতোয়াই। নদীর এক পাড় থেকে দেখা যায় চিনা শৈলীতে গড়া অসাধারণ সিয়াংশান মন্দির।

লঙমেনে কোনও কৈলাশ টেম্পল নেই।

কেবলই বুদ্ধমূর্তি। তাদের ক্ষুদ্রতমটির আকার ১ ইঞ্চি ও বৃহত্তমটি ৫৭ ফুট। বেশির ভাগই ছোট ছোট কুলুঙ্গির মধ্যে। ৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে এটি সম্পূর্ণ হয়। নদী-সংলগ্ন পথ থেকে প্রায় ৫০টি সিঁড়ি ভেঙে বিশাল গুহামুখে উপবিষ্ট বৈরোচন বুদ্ধ। মুখে অপার্থিব হাসি, সঙ্গে এক স্পষ্ট কৌতুকের ছোঁয়া।

অজন্তায় অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি ছিল গুহাচিত্র, এটি প্রস্তর মূর্তি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইসব সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েও চোখ ক্লান্ত হয় না। অবলোকিতেশ্বরের উন্নত মস্তকে শিল্পী পরিয়েছিলেন রত্নখচিত রাজমুকুট, কণ্ঠে মুক্তোর শতনরী, কর্ণে রত্নকুন্তল, বক্ষে কেবল উপবীত। তবু ছিল তাঁর আনত দৃষ্টিতে করুণাঘন আননে ত্যাগের মহিমা। বৈরোচন বুদ্ধের শিল্পী তাঁকে রত্নালংকারে ভারাক্রান্ত করেননি। এখানে শাক্যসিংহের অঙ্গে পট্টবস্ত্র, বক্ষে দশছড়া হার। মস্তক, কর্ণ, কণ্ঠ ভূষণহীন। বিষয়-বিষবিকারের ঊর্ধ্বে মহাভিক্ষু এক মহাপ্রাণ হাসি ছড়িয়ে রেখেছেন। অপার আনন্দময় পুরুষ।

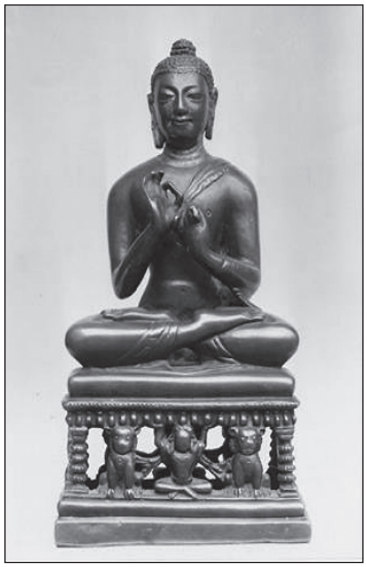

বৈরোচন বুদ্ধ

বলা হয়ে থাকে, দেশে দেশে যত বুদ্ধমূর্তি গড়া হয়েছে তার মধ্যে গান্ধারমূর্তি সেরা। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সেই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে একমত হয়েছিলাম এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে। আবার সারনাথ বুদ্ধের কৈশোর লাবণ্যেও অভিভূত হয়েছিলাম। লণ্ডমেনের এই দীপ্তিময় বৈরোচন বুদ্ধকে দেখে মনে হয় সুন্দরের কোনও কার্ডিনাল বা অর্ডিনাল মেজারমেন্ট হয় না। এই মূর্তিকে এদেশের লোক 'চাইনিজ মোনালিসা' বলে। এঁর মুখশ্রীর সঙ্গে নাকি রানি জেটিয়ানের সাদৃশ্য ছিল।

বুদ্ধের দর্শন কীভাবে বিশ্বকে ঋদ্ধ করেছে, তা নিয়ে নতুনভাবে গবেষণায় মেতেছে চিন। আমাদের চারধামের মতো তারা পৃথক পৃথক পাহাড়শীর্ষে গড়ে তুলেছে চারটি প্রধান বুদ্ধকেন্দ্র। সরকারি উদ্যোগে উংসি-তে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে গড়ে তুলছে লিংশান বুদ্ধিস্ট ওয়ান্ডারল্যান্ড।

সম্প্রতি চিনের নানচেঙ শহরে ২০০০ বছরের প্রাচীন এক পরিত্যক্ত বৌদ্ধ স্তূপকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছে সেদেশের সরকার। ৩৬০০ মিটার উচ্চতায় সম্রাট অশোক প্রেরিত স্মারককে সযত্নে স্থাপন করে সেখানকার ফু রাই ফাউন্ডেশন নির্মাণ করেছে এক সুউচ্চ অশোকস্তম্ভ। তারা দাবি করে, বিশ্বের নানা দেশে অশোক প্রেরিত চুরাশি হাজার স্মারকের মধ্যে উনিশটি আছে চিনে।

মধ্য এশিয়া, চিন, তিব্বতের সঙ্গে বুদ্ধ বহনের মহান ভূমিকায় নেপালও এক মর্যাদার আসন নিয়ে অবস্থান করছে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্রান্তিকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একাধিক জরিপকার্যের পরোক্ষ প্রাপ্তি লুপ্ত বৌদ্ধ ধর্মের আবিষ্কার। সেই কাজে শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে নেপালও সরবরাহ করেছে নানান অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান।

এশিয়াতে ইরান ও তার পূর্বাঞ্চলে ইসলামের আগমনের আগে ব্যাকট্রিয়া, পারসিয়া, আফগানিস্তান, গান্ধার, চিনা তুর্কিস্তানের মতো অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ছিল প্রচলিত ধর্ম। অনেক স্থানে

সংস্কৃত ছিল ব্যবহৃত ভাষা। ফ্রান্সিস বুকাননের মতো গবেষক আভা (ব্রহ্মদেশে) ও নেপালে 'But' নামে বুদ্ধস্মরণের প্রচলন লক্ষ করেছিলেন ১৭৯৭ সালে। এক অজানা মহাপুরুষ ও তাঁর চিন্তাভাবনার অস্তিত্বের ভ্রূণ তখনই প্রথম অঙ্কুরিত হয়।

ইসলামের আগমন ঘটে এই But বিরোধিতার মধ্যে। আরবি ভাষায় But-এর অর্থ মূর্তি। যে-কোনও আদর্শের মতো ধর্মের বিকাশেও সংগঠিত প্রচারের ভূমিকা প্রবল। জ্ঞানযোগী অপেক্ষা ভক্তিযোগীরা এক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রগুলি ছিল প্রধানত শহরে এবং আগ্রাসী ইসলামের বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম তখন কোনওরকম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে সন্ন্যাসীরা নেপাল, তিব্বত, চিন, ভূটান এমনকী আরাকানের চট্টগ্রামের মতো প্রত্যন্ত পার্বত্য কেন্দ্রে ধাবিত হন। অন্যভাবে বলা যায় হিমালয় তাঁদের দেয় বাঞ্ছিত আশ্রয়। বুদ্ধের সমগ্র জীবন জুড়ে ছিল হিমালয়ের তরাই ও সেখানকার অরণ্য ও জীবজগতের সঙ্গে মধুর সহবাসের শিক্ষা; বৌদ্ধধর্মের সেই ঐতিহাসিক সংকটের দিনেও হিমালয় হয়ে উঠেছিল আর্ত অর্হৎদের কাছে নিরাপদ স্থল।

গান্ধার বুদ্ধমূর্তি

চিনের লুওয়ান-শিয়ান—যে-অঞ্চলটিকে ইউনেস্কো এথেন্স, জেরুজালেম ও মক্কার সঙ্গে স্থান দিয়েছে—সেই অঞ্চলের বৌদ্ধিক পুষ্টিসাধনে কাশ্মীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। গান্ধার, কাশ্মীর, খোটান, তুর্কিস্থানে সংস্কৃত যখন ছিল কথ্য ভাষা তখন শ্রীনগর ছিল সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের melting pot.

চিনে শিয়ান-এর ইতিহাসে মধ্য এশিয়ার করাসর কুচবাসী (বর্তমান সিংজিয়ান) যে-বৌদ্ধ ভিক্ষুটির নাম মিশে আছে সেই কুমারজীব (৩৪৪ খ্রিস্টপূর্ব—৩১৩ খ্রিস্টপূর্ব) ছিলেন এক উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ আধিকারিকের সন্তান। প্রখ্যাত চিনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন ছিলেন তাঁর ছাত্র। কুমারজীবের দুশো বছর পর আর এক গ্রন্থপ্রেমী সন্ন্যাসী লুওয়ান থেকে শিয়ানে সংস্কৃত শিখে কাশ্মীরে আসেন। তিনি আমাদের অতি পরিচিত হিউয়েন সাং।

হিমালয়ের অংশ না হলেও, উত্তর চিন সমভূমিতে মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে যে-মহাপ্রাচীর আশ্চর্য মর্যাদা নিয়ে অবস্থান করছে সেখানেও বুদ্ধের উপস্থিতি উল্লেখ্য। প্রাচীরের জুয়াং পাস-এ 'ক্লাউড টেরাস'-এর পাথরে হাজার বছর আগে খোদিত

ক্লাউড টেরাস, জুয়াং পাস

বুদ্ধমূর্তি ও সংস্কৃত ভাষায় খোদিত তাঁর বাণী আজও বিদ্যমান।

## অচেতন উদাসীনতা

মহামতি শংকর সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর মূল্যবান উপলব্ধি ব্যক্ত করে বলেছেন, ''It is evident enough that in his name, a strong wave of Saivism swept up all the valleys of the Himalayas... Shankaracharya is rather the end of a process than an individual.'' নিবেদিতার এই উক্তিটিতে Saivism-এর স্থলে Buddhism, Shankaracharya-র স্থলে Buddha আর end-এর স্থলে beginning বসালে সন্দেহ নেই আর একটি শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

এটি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে সম্রাট অশোকের পরবর্তী কালে, বিশেষ করে খ্রিস্টজন্মের পর প্রথম পাঁচশো বছর বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাবের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি। শংকরাচার্যের আগমনকে সেই পথে নিছক episode না বলে epoch বলা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, বুদ্ধের আবির্ভাবের পর ভারত যে-উচ্চ অবস্থায় পৌঁছেছিল তেমনটি কখনও হয়নি।

অনুমান করাই যায় বৈদিক কর্মকাণ্ডে যখন মানুষ শ্রদ্ধা হারাতে বসেছিল তখন সে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখসমূহের অভিঘাতে অত্যন্ত পীড়িত বোধ করেছিল। এই দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়ই হয়ে উঠেছিল মূল জিজ্ঞাস্য— 'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা'। একথা সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি দর্শনের গোড়াতেই স্বীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধের দর্শনচিন্তার সঙ্গে কপিলের সাংখ্যযোগের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক মূল্যবান আলোচনা করেছেন। সিদ্ধার্থের জন্মের আগে থেকেই কপিলাবস্তুতে কপিলমুনির ভাবনাপ্রসূত সাংখ্যচর্চা প্রচলিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যে বুদ্ধদেবকে যজ্ঞে পশুবধের নিন্দাকারী করুণার অবতার বলে স্তুতি করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গৌতম বুদ্ধের এই বেদনিন্দার মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের হিব্রু নবী মিকা (Micah)-র প্রতিধ্বনি ঘোষিত হয়। মিকা বলেছেন, ''প্রভু কি হাজার মেষের রক্ত বা হাজার নদী তেল পোড়ানোর ফলে তৃপ্ত হবেন? আমি কি আমার প্রথম সন্তানকে নিজের পাপমুক্তির জন্য বলি দেব?''

বিষ্ণুপুরাণেও বলা হয়েছে বুদ্ধদেব বেদের নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আবার (সম্ভবত পরবর্তী কালে রচিত) স্কন্দপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে তাঁকে করুণাঘন ও ক্ষমার অবতার বলা হয়েছে।

মধ্যযুগে বাংলা তথা ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম একরকম বিলুপ্ত হয়েছিল। প্রায় এক হাজার বছর এদেশ তার অতলান্তিক উদাসীনতায় ভুলেছিল বুদ্ধকে। কারও কারও মতে ভারতের ক্ষেত্র থেকে উপচে পড়ে বৌদ্ধ ভাবনা প্লাবিত করেছিল এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশকে। তরল উপচে পড়লে পাত্রের ধারণক্ষমতার অতিরিক্তটুকুই নিঃসৃত হয়। এক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তাই বলা যেতে পারে শঙ্খ আকৃতির ভারত উপমহাদেশ থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠমানব ও তাঁর প্রচলিত ভাবনা funnelled out হয়ে বিন্দু বিন্দু পতিত হয়েছে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশে।

সনাতনি চিন্তা যেখানে প্রবল, শাস্ত্রের বিধান যেখানে অপরিবর্তনীয়, সেখানে ইতিহাস মর্যাদা পেতে পারে না। ইতিহাস একথাই জানায় যে জগৎ সদা পরিবর্তনশীল। সেই কারণেই কেবল বিবরণ নয়, তার সূত্র, কার্যকারণ, সিদ্ধির সন্ধানও ইতিহাসের অন্বিষ্ট। ভারতের বুদ্ধদেবের চিনে বেশি

ফোতুলা টপের মৈত্রেয় বুদ্ধ

সমাদরের কারণ নিয়ে ভারতে যথেষ্ট গবেষণা না হওয়ার কারণ আমাদের ইতিহাস-সচেতনতার অভাব। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গ্রিক ঋষি হেরাক্লিটাস বলেছিলেন, কেউ একই নদীতে দুবার স্নান করে না। কারণ নদীর জল সতত প্রবহমান। ইতিহাসও তেমন।

রাজ অনুগ্রহ (feudal patronization) ব্যতীত কোনও মতের প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন। সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থবির মহেন্দ্র প্রমুখ ধর্মদূত দ্বারা ২৪১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শ্রীলঙ্কা বুদ্ধভাবনায় ঋদ্ধ হয়। সেখান থেকে একদিকে ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার), শ্যাম (থাইল্যান্ড), অন্যদিকে গ্রিস, ইরান, কাশ্মীর, গান্ধার প্লাবিত হয় বৌদ্ধ ভাবনার জাগরণে। কণিষ্ক উদ্যোগী হন বুদ্ধের বাণীকে সংস্কৃতে অনুবাদে। ৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে কাবুল থেকে ভারতীয় শ্রমণ সঙ্ঘভদ্র সংস্কৃত ধম্মপদের এক পাণ্ডুলিপি নিয়ে যান চিনে। হিমবন্ত গিরিপথ অতিক্রম করে মধ্য এশিয়ার তুরফান অঞ্চলেও ধম্মপদের খণ্ডিত অংশের সন্ধান মেলে। চিনা ভাষায় ধম্মপদের চারটি প্রাচীন অনুবাদ বিদ্যমান। বিঘান ও লুইবেন তা ২২৩ খ্রিস্টাব্দে অনুবাদ করেন।

বর্তমানে একদিকে যেমন দেখা যাচ্ছে বামিয়ানের মতো অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদকে ধ্বংস করার দানবীয় প্রয়াস, তেমনই জানা যাচ্ছে কাশ্মীর হিমালয়ের তেরো হাজার ফুটে ফোতুলা টপে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে গড়া কুড়ি ফুট উচ্চতার মৈত্রেয় বুদ্ধর কথা। একইভাবে জানা যায় হিমালয়ের পাদদেশের অদূরে বিহারে মোতিহারিতে অতি উচ্চ কাসারিয়া স্তূপের আত্মপ্রকাশের কাহিনি।

সম্প্রতি চিকিৎসক পর্যটক আশিস কুণ্ডু ও তাঁর সহযাত্রী আলোকচিত্রী দিলীপ ব্যানার্জি তাজিকিস্তান সফরে গিয়ে দুশাম্বে শহরের স্টেট মিউজিয়ামে চোদ্দো মিটার দৈর্ঘ্যের শায়িত বুদ্ধের মূর্তি দর্শনের কথা লিখেছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর এই কুশান যুগের মূর্তিটি ১৯৬৬-তে দুশাম্বে শহরের দক্ষিণে আজিনা টেপ্পা অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়। রুশ সরকার মূর্তিটিকে একশো টুকরো করে লেনিনগ্রাদ নিয়ে যেতে ব্যর্থ হলে ২০০১ সালে এটি যথাসম্ভব পুনর্নির্মাণ করে

কেসরিয়া স্তূপ

'নির্বাণ বুদ্ধ', আজিনা টেপ্পা

দর্শকের জন্য রাখা হয়।

ভিনসেন্ট স্মিথের মতে বৌদ্ধ পুরোহিততন্ত্রকে হত্যা করেই ইসলাম পশ্চিম হিমালয় ও পামির অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মকে নিঃশেষ করেছে। বুদ্ধের দেশ ভারতবর্ষে তাঁর প্রচারিত ধর্ম এতটাই অস্তিত্ব হারিয়েছিল যে সম্রাট আকবর তাঁর রাজসভায় সব ধর্মের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানালেও বৌদ্ধধর্মের কাউকে ডাকেননি। বলা যায় বৌদ্ধধর্মই তাঁর কাছে ছিল অজানা।

১৫৫০-৫১ সালে জাপানে রিনজেন জাই, 'শয়তানের প্রতারণা' সংক্রান্ত একরকম প্রচলিত ধারণাভিত্তিক কোনও ধর্মের অস্তিত্বের কথা বলেন। ফ্রান্সিস জেভিয়ার তাকে ধর্ম বলে মানতে চাননি। উল্লেখ্য যে, বুদ্ধদেবের চিন্তাভাবনাকে এক প্রকার তান্ত্রিক মোড়কে সেখানকার ক্ষমতাবানরা জাপান, তিব্বত, চিনে প্রচার করত।

আর একজন ইতালীয় মিশনারি ষোড়শ শতকের শেষে চিন ভ্রমণকালে সেখানকার প্রচলিত ধর্মে 'Flat earth concept' দেখে (প্রাচীন চৈনিক বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর গড়ন বর্গাকার) তাকে পিথাগোরাসীয় ভাবনা বলে মনে করেন। তিনি এও বলেন যে এই ধারণাটি চিন গ্রিস থেকে ভারতের মাধ্যমে পেয়েছে। পরবর্তী কালে ক্যাথলিক দুনিয়া একে লামাতন্ত্র বলে প্রচার করে।

এর পরের একশো বছরেও বুদ্ধদেব অনাবিষ্কৃত থেকে যান। অবশেষে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অনেক নির্ভরযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হতে থাকে। এগুলি পরিলক্ষিত হয় মূলত ব্রহ্মদেশ ও সিলোনে (এখনকার শ্রীলঙ্কা)। বেশ কিছু মূল্যবান তথ্যও সামনে আসতে শুরু করে। গবেষক, অনুসন্ধানকারীরা অনুমান করতে থাকেন, এই বিশ্বাসভিত্তিক জীবনচর্চার উৎস হতে পারে ভারত। যদিও তখনও পর্যন্ত ভারত মূলমঞ্চে আসেনি বা বলা যায় ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আসা মিশনারিদের নজরে তেমন কিছু পড়েনি। পশ্চিম উপকূলে ইতিমধ্যে ভাস্কো এসে সিরীয় চার্চের সন্ধান পেয়ে হতাশ হন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন তিনিই জলপথে ভারত আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে প্রথম খ্রিস্টধর্মকে নিয়ে আসবেন। এছাড়া নিজের অজ্ঞতার দরুন ভাস্কো এদেশে হিন্দু ধর্মেরও উপস্থিতি টের পাননি। সব মন্দিরকেই তিনি মসজিদ ভেবেছিলেন। মঙ্গেশ টেম্পলের মতো চূড়াহীন মন্দিরগুলিকে তিনি বাসভবন ভেবেছিলেন। হিন্দুরা অহিন্দুদের হাতে ধ্বংস থেকে বাঁচতে সবুজের মধ্যে এমন মন্দির গড়ত।

ভারতবর্ষ থেকে ভগবান বুদ্ধের পশ্চিমমুখী সমীরণ বামিয়ান হয়ে ইরান ছুঁয়ে হেয়ারপিন বাঁক নিয়েছিল। খ্রিস্টাব্দের প্রথম শতকেই (৬৮ সালে) বৌদ্ধধর্ম মহাচিনে প্রবেশ করলেও তিব্বতে তার আবির্ভাব ঘটে অনেক পরে। তিব্বতের প্রথম ধর্মপ্রাণ সম্রাট হিসেবে সংস্তেন (তিব্বতি ভাষায় সংস্রন) গাম্পোর কথা ভাবা হয়। তিনি সপ্তম শতকে তিব্বতকে ঐক্যবদ্ধ করে কৃষি থেকে শিক্ষা—সর্বক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। পশ্চিমের খোটান, কাশ্মীর ছাড়া নেপাল, চিন, মগধ, বঙ্গদেশ থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো-

বাতাসে তিব্বতকে সমৃদ্ধ করেন। কাশ্মীরের সারদা লিপি এবং মগধ ও বাংলার নাগরী অক্ষরের বর্ণমালা থেকে তিব্বতে বুচন বর্ণমালার প্রবর্তনও তাঁর অবদান। পরবর্তী কালে তিব্বতে শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতো কালজয়ী ভারতীয় 'মনীষা' বুদ্ধিমুক্তি ঘটালেও বহুদিন বিশ্বসাথে যোগে তিব্বতের ছিল গভীর অনীহা। তাই ১৬২৪-এ জেসুইট পাদরিদের তিব্বত অভিযান শুরু হলেও তাঁদের বিতাড়িত হতে হয় তিন বছরের মধ্যে। অবশ্য উৎসাহীদের অভিযান থেমে থাকেনি।

## কয়েকজন ইউরোপীয়ের কথা

হিমাচলের পুচ্ছপ্রান্ত ব্রহ্মদেশ আর অশ্রুবিন্দু দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মকে আগলে রেখে তার পুনর্জাগরণে এক অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। সিলোনের প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ফ্রেডরিখ নর্থ উপনিবেশ গঠনে একদল প্রতিভাবান অবিবাহিত তরুণকে নির্বাচিত করেছিলেন। তিনি নিজেও তখন অবিবাহিত। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল ম্যাকডোয়াল ও বিস্ময়কর প্রতিভাবান ফরাসি জনভিল।

জনভিল অল্প সময়ে দুর্বোধ্য সিলোনি ভাষায় কেবল ব্যুৎপত্তি অর্জনই করেননি, সে-দেশের ধ্রুপদী কবিতা 'কোকিলা সন্দেশায়া'-র প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করে ফেলেন। তাঁকে নিয়ে ম্যাকডোয়াল মাত্র ৮০ মাইল দূরত্বের ক্যান্ডিতে এক মাসের বেশি সময় নিয়ে পৌঁছন। সেখানকার রাজাকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে ম্যাকডোয়াল তেমন কিছু না পেলেও জনভিল এক অসাধ্যসাধন করে বসেন। ফরাসিতে 'Quelques Notions Sur I'isle de Ceylan' শিরোনামে এক পাণ্ডুলিপিতে সেখানকার ধর্ম ও রীতিনীতি নিরীক্ষণ করে নিঃসন্দেহ হয়ে ঘোষণা করেন Burmans (ব্রহ্মদেশ), Siamese (থাইল্যান্ড) এবং সিংহলের ধর্মচর্চা অভিন্ন, এইসব দেশে নানা নামে একই দেবতা পূজিত। ব্রহ্মদেশে তিনি Le Gaudama, শ্যামদেশে le Sommono-codom আর সিংহলে Saman Gauteme। এমনকী এইসব দেশে ঘণ্টা-আকারের স্তূপগুলির (যা কিনা 'ডাগোবা' হিসেবে পরিচিত) মধ্যেও তিনি অভিন্নতা লক্ষ করেন।

ব্রিটিশ অনুসন্ধিৎসার অন্য পরাকাষ্ঠা মেলে ১৬৮০ সালে রবার্ট নকস (Robert Knox) লিখিত ইতিহাসে। মাদ্রাজের এশিয়াটিক সোসাইটির উজ্জ্বল রত্ন উইলিয়াম চেম্বার এটি পড়েন। তিনি সেইসঙ্গে আর এক ফরাসি La Loubere-র পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্দর্ভ du Royaume de Siam-ও পড়ে ফেলেন। লেখক শ্যাম দেশের আইন যে-ভাষায় লেখা হয়েছিল সেই Bali (Pali)-র সঙ্গে তামিল ও সংস্কৃতের মিল খুঁজে পান। ফলে বলা যায় একজন ব্যক্তি বুদ্ধকে ও অন্যজন তাঁর ব্যবহৃত ভাষার কিছু কিছু ইঙ্গিত দিতে থাকেন।

উইলিয়াম চেম্বারের অনুমানভিত্তিক লেখাটি ড. ফ্রান্সিস বুকাননের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কেউ গ্রহণ করেনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রেরিত এই তরুণ চিকিৎসকটি তখন মধ্য তিরিশে অবস্থান করছেন।

ভারতীয় পরিসংখ্যানচর্চার পথিকৃৎ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁর বিখ্যাত বিজ্ঞান কংগ্রেস ভাষণ 'Why Statistics'-এ ভারতে পরিসংখ্যাগত সমীক্ষায় (Statistical Survey) তিন জন প্রাতঃস্মরণীয়ের উল্লেখ করেছিলেন। এঁরা হলেন চাণক্য, আবুল ফজল আর ড. ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকানন FRS, FRSE, FLS, FAS-FSA, DL। এই স্কটিশ চিকিৎসকটি নিজের পেশার বাইরে ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা এমনকী আর্থ-ধর্মীয় গবেষণাতেও অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

আভাতে (ব্রহ্মদেশ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক প্রতিনিধিদলের সভ্য হয়ে তাঁর আগমন। সে-দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'On the Religion and Literature of Burmas' তাঁর প্রথম জ্ঞানগর্ভ রচনা। তিনি নক্স-এর অনুমানের প্রায় একশো বছর পর ইংরেজিতে প্রথম Buddhism শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৭৯৯ সালে লেখাটি এশিয়াটিক রিসার্চের ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশ পায়।

ব্রহ্মদেশীয় উৎস ঘেঁটে বুকানন অনুমান করেন, বুদ্ধদেব ৬২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৪২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অপ্রকট হন। তিনিও চেম্বারের মতো এই ধর্মের শিকড় সন্ধানে ভারতবর্ষের সম্ভাবনার কথা বলেন। তাঁর এই অনুমান পারস্যের ঐতিহাসিক ফারিস্তা অনূদিত কল্‌হনের রাজতরঙ্গিণীতে সমর্থিত হয়। তাতে বলা হয়েছে কাশ্মীরের ৪৩তম রাজা জেন্না সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূচনা করেন, যদিও বুদ্ধভাবনার বিরোধিতা করা হয়নি। অবশেষে ৫৯তম রাজা নেরখের হাতে কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্মের সমাধি রচিত হয়।

১৮০২ সালের এপ্রিলে বুকানন নেপালে প্রেরিত হন। সেখানকার স্তূপের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের স্তূপের মিল লক্ষ করেন তিনি। সেই সঙ্গে তাঁর অবিস্মরণীয় আবিষ্কার নেপালের নেওয়ার উপত্যকায় শাক্যসিংহের সন্ধানলাভ। তিনি বলেন, ব্রহ্মদেশে ও তিব্বতের লাসাতেও একই ব্যক্তি পূজিত হন।

১৮০৩ সালে বুকানন কলকাতায় এলে ঐতিহাসিক Statistical Survey of Bengal-এর দায়িত্ব পান। ১৮১১ সালে তাঁর ছোট দলটিকে নিয়ে তিনি ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাটনা থেকে গয়ার পথে যেতে বোধগয়া নামক গ্রামে লক্ষ করেন অনেক বাড়িই পাথরের ভগ্নাংশ ও গ্রানাইট থাম দিয়ে বানানো হয়েছে। পদ্মাসনে বসা পাথরের বুদ্ধমূর্তিগুলির নিম্নাংশ তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। কবছরের মধ্যেই ব্রহ্মদেশ থেকে দুটি পৃথক প্রতিনিধিদলকে এনে তিনি ধর্মীয় ভাবনা ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাযুজ্যের প্রশ্নে নিশ্চিত হলেন। ব্রহ্মদেশীয় সাধুরা মনে করতেন এই সেই স্থান যেখানে বুদ্ধ অবস্থান করতেন। তাঁরা সেই বোধিবৃক্ষটিকেও চিহ্নিত করলেন।

১৮১১-র ডিসেম্বর মাসে গয়ার জরিপের কাজ শেষ করে বুকানন দক্ষিণে যাত্রাপথে একটি কলাগাছের জঙ্গলের পিছনে এক সুউচ্চ ক্ষয়প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করলেন। সেখানে এক বৃদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসীর দেখা পান তিনি, যিনি ওই ধ্বংসস্তূপকে এক অজানা দেবতার আবাসস্থল হিসেবে ভাবতেন। তিনি বলেন, প্রায় একশো বছর আগে চেতন গিরি নামের এক সন্ন্যাসী ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করে ওখানে বাস করতেন। কালক্রমে তাঁর কিছু ভক্ত হয় এবং কিছু বণিকও তাঁর কাছে আসতে থাকে। সেই সন্ন্যাসীর মৃত্যুর পর বেশ কিছু গৌতমমুনির মূর্তি বানানো হয়। কিন্তু কে এই মুনি তা তাদের অজানা। বুকানন জানতেন বেশ কয়েক বছর আগে আভার রাজা দুজন দূতকে এই অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন। সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সেই ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বলেন, ব্রহ্মদেশীয় কয়েকজন সেখানে ব্রহ্মবৃক্ষের সন্ধানে এসেছিলেন। সেই সন্ন্যাসীকে সঙ্গী করে নীলাঞ্জন নদীর দিকে আবিষ্কৃত হয় বিশাল ভগ্নস্তূপ, যার প্রস্তরখণ্ড স্থানীয়রা গৃহনির্মাণে যুগে যুগে ব্যবহার করেছে।

এইসময় একদিন বারাণসীর রাজা চৈত সিংহের দেওয়ান জগৎ সিং-এর কাছ থেকে জনাথন ডানকান একটি চিরকুট পেলেন। তাতে বলা ছিল জগৎ সিং তাঁকে একটি বিশেষ বস্তু দেখাতে চান। একদল মানুষ শহরের বাইরে গৃহনির্মাণদ্রব্য সংগ্রহ করতে গিয়ে এক ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি পাথরের রত্নালঙ্কার পেটিকার মধ্যে সবুজ রঙের ভিক্ষাপাত্র পেয়েছে। হিন্দু বা জৈন কোনও সম্প্রদায়েরই ওই

অঞ্চলে বসবাস ছিল না। জগৎ সিং-এর লোকজন ওই ভগ্নস্তূপে তিরিশ ফুট খননকার্য চালালে একের পর এক কুঠুরি আবিষ্কৃত হয়।

ডানকানের উপস্থিতিতেই সেইসব কুঠুরি থেকে কিছু মানব অস্থি মেলে। স্তূপ থেকে উদ্ধার হয় বুদ্ধের এক পদ্মাসন মূর্তিও। পাথরে খোদিত কিছু লিপিও আত্মপ্রকাশ করে। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বারাণসী সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের এনে ডানকান সেই লিপির মর্মার্থ উদ্ধার করলে জানা যায় ১০৮৩ সংবতে গৌড়ের রাজা বসন্ত পাল ও তাঁর ভাই শ্রীথা পাল এগুলির মাধ্যমে বারাণসীবাসীকে বুদ্ধের শরণ নেওয়ার আবেদন করছেন।

মহাবোধি মন্দির, বুদ্ধগয়া

ডানকান যখন সারনাথের অস্তিত্ব উন্মোচন করছেন তখন বুকানন বুদ্ধগয়ায় ফলকে একই লেখা পাচ্ছেন। বলা যায়, অমিতাভ দিবাকরের মতো বুদ্ধ-উদয়ের উষালগ্ন যেন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক গগনকে উদ্ভাসিত করতে চলেছিল।

পরবর্তী তিন মাস বুকাননের ক্যারাভান গয়া-রাজগৃহ-নালন্দা অঞ্চলকে ঘিরে এক ধরনের সৃষ্টিসুখের উল্লাসে যেন মেতে থাকল। রাজগির (রাজগৃহ) থেকে অনতিদূরে উত্তর-পশ্চিমে বারাগাঁও গ্রামে বিশাল ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পেলেন তিনি। জানলেন এগুলো কুণ্ডলপুরের ধ্বংসাবশেষ। এটি বিদর্ভরাজ ভীমাকের রাজধানী, পুরাণমতে যিনি কৃষ্ণপত্নী রুক্মিণীর পিতা, সেখানে বুকানন বটুক ভৈরব নামে পূজিত গৌতম বুদ্ধের একটি অবিকৃত মূর্তি দর্শন করেন। তিনি তখন জানেন না যে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্মোচিত করেছেন।

মাসের পর মাস এই আবিষ্কারযাত্রা চলার সাড়ে তিন বছর পর বুকানন দেশে ফিরে যান। শেষের দিকে তিনি এক মর্মান্তিক হতাশায় আক্রান্ত হন। মনের দুঃখে যা লেখেন তার মর্মার্থ হল, "উলু বনে মুক্তো ছড়িয়ো না। বরং তোমার সংগ্রহ নিজের কাছে রেখে উপযুক্ত পাত্রে দান কোরো।" এক ধোঁয়াশার মধ্যে বুকানন কলকাতা ছাড়েন। গভর্নর জেনারেল লর্ড ময়রার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। সাত বছর ধরে অনেক কষ্টে সংগৃহীত স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে সংক্রান্ত পুঁথি, জার্নাল, নোট প্রভৃতি তিনি রেখে যেতে বাধ্য হন। সেগুলি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের মহাফেজখানায় দু-দশক বাক্সবন্দি ও

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাইলবন্দি ছিল। অবশেষে ১৮৩৮-এ রবার্ট মন্টগোমারি মার্টিনকে সেগুলি প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয় যা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হয় মন্টগোমারির নামে।

বুকানন-পুত্র ১৮৮০ সালে পিতা সম্পর্কে লেখেন, তিনি জীবনসায়াহ্নে গৃহসজ্জা, শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক বন্ধুদের সঙ্গে চিঠিপত্রাদি আদানপ্রদান প্রভৃতি নিয়েই ছিলেন। চার্লস অ্যালেন অনবদ্য ভাষায় বুকাননের স্মৃতি তর্পণ করে লিখেছেন, "Dr. Francis Buchanan, Dr. Francis Hamilton, Dr. Francis Hamilton Buchanan and Dr. Francis Buchanan Hamilton all crop up in accounts of the period, and all have some claim to fame. Perhaps now that these four avatars are once more united in one person, posterity will give the doctor his due."

বুকাননের রেখে যাওয়া বুদ্ধ-আবিষ্কারের পরম্পরা ধরে রাখায় আরও বহু বিদেশির মধ্যে যে-তিনজন সমবয়সি ইংরেজের নাম অবশ্য উল্লেখ্য—জর্জ টার্নার, ব্রায়ান হজসন এবং জেমস প্রিন্সেপ। এছাড়া ঋষিতুল্য তিব্বতপ্রেমী যে-হাঙ্গেরীয়টি এদেশে বুদ্ধ-আবিষ্কারে অক্ষয় আসন নিয়ে আছেন তিনি হলেন কসমা দ্য করোসি। এঁরা সকলেই পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত বিশ্লেষণের দাবিদার।

সভ্যতার ইতিহাসে ভারতের অন্যতম অবদান বৌদ্ধ দর্শন। আর এই প্রসঙ্গেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল বুদ্ধপূর্ণিমার তিথিটি। অনেক দেশেই এই উৎসব জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। শ্রীলঙ্কায় এই উৎসবের নাম বেশখ, নেপালে স্বানিয়া পুন্‌হি, মায়ানমারে কাসোন, তিব্বতে সাগা দাওয়া, ইন্দোনেশিয়ায় হরি রায়া ওয়াইসাক, মালয়েশিয়ায় হরি ওয়েসাক, কাম্পুচিয়ায় বিশক পূজা, থাইল্যান্ডে বিশাখ বুচা, ভিয়েতনামে ফট দন, লাওসে বিকসাখা বোউকসা। চিনে এর নানান নাম—ফো তান, ও ইয়ু ফোচিয়ে। জাপানে হানা মাৎসুরি। এসব দেশ দিনটির ভারতীয় উৎসের কথা মনে রাখলেও আমরা এই দিনটিকে একটি ছুটির দিনের বেশি কিছু ভাবি না।

আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে 'সফ্‌ট পাওয়ার' কথাটা খুব প্রচলিত। কোনও দেশ অন্যান্য দেশের উপর নিজের সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারলে যে-কূটনৈতিক শক্তি অর্জন করে সেটাই 'সফ্‌ট পাওয়ার'। আত্মবিস্মৃত ভারত বৌদ্ধ দর্শনের এই 'সফ্‌ট পাওয়ার' দাবি করে না।

## সহায়ক গ্রন্থ


১। Peter Van Ham, *Indian Tibet, Tibetan India : The Cultural Legacy of the Western Himalayas* (Niyogi Books: New Delhi, 2009)

২। *ভবানী সেন রচনা সংগ্রহ* (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৭৭)

৩। সীতাংশু চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের ধর্মসাধনা ও গৌতমবুদ্ধ* (হরফ, ১৯৭৮)

৪। Juan Mascaro, *Introduction to Bhagawad Gita* (Penguin: London 1962)

৫। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *গৌতম বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তা* (হরফ, ১৯৭৮)

৬। কুণাল চট্টোপাধ্যায়, *বিদেশিদের সংস্কৃত আবিষ্কার* (পরম্পরা, ২০১৯)

৭। B.R. Ambedkar, *The Decline and Fall of Buddhism* (Govt. of Maharastra), Vol. III

৮। Charles Allen, *The Search for the Buddha: The Men Who Discovered India's Lost Religion* (Basic Books: New York, 2003)